ইউনিট
১২

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। সমাজ নির্ধারিত সাধারণ জীবন যাত্রার মানের চেয়ে যাদের জীবন যাত্রার মান কম তারাই দরিদ্র এবং এই দরিদ্র অবস্থাকেই দারিদ্র বলে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রদত্ত দারিদ্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী "দারিদ্র বলতে জীবনযাত্রার নূন্যতম মানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার হতে বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা বোঝায়।" দারিদ্র একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রভৃতি মৌল মানবিক চাহিদা পূরনের অক্ষমতাই হচ্ছে দারিদ্র। একটি নূন্যতম পরিমান আয় উপার্জন ছাড়া এ সমস্ত অভাব পূরণ করা যায় না। তাই একটি নূন্যতম পরিমান আয় উপার্জনের অক্ষমতাকেই দারিদ্র্য বলা হয়। বাংলাদেশে দারিদ্র্য গণনা করা হচ্ছে মূলতঃ দুই ভাবে, প্রথমতঃ দুইটি "দারিদ্র্য রেখা" টাকা হচ্ছেঃ একটি "মোটামুটি দারিদ্র রেখা" ও আর একটি "চরম দারিদ্র রেখা" তারপর এই দুই রেখার নীচে কতজন মানুষ আছে তা গণনা হচ্ছে। দ্বিতীয়ঃ দারিদ্রের সামষ্টিক তীব্রতা মাপাবার জন্য দারিদ্র রেখার কতো নীচে কতজন করে মানুষ আছে তার একটা কম্পোজিট ইনডেক্স নির্মান করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য রেখাটি টানা হচ্ছে গড়পরতা একজন মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা অটুট রাখবার জন্য যে পুষ্টি (ক্যালরি ও আমিষ) প্রয়োজন তা কেনবার খরচ ধরে এবং খাদ্য ছাড়া অন্যান্য "মৌলিক চাহিদা" পূরনের জন্য এর ওপর আরো ৩০% যোগ করে। এ ৩০% যুক্তিটা এইভাবে দেয়া হচ্ছে যে, মোটামুটি দরিদ্র পরিবাররা তাদের মোট খরচের ৭০% এর মতো খাদ্যদ্রব্যের ওপর খরচ করে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের পাশাপাশি কতিপয় বেসরকারি (এন.জি.ও) প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। এ সমস্ত এন. জি. ও প্রধানত গ্রামের বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের জন্য আত্ম–কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে ব্যবহৃত দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা নির্ণয় করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য প্রবণতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী দারিদ্র্য প্রবণতা তুলনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত অর্থাৎ সমাজের আয় বৈষম্য পরিস্থিতি বিশ্লেষন করতে পারবেন।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি ঃ

দারিদ্র্য ধারণাটির উতপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে।বঞ্চনা একটি সামাজিক ধরনা যা কাল এবং স্থানভিত্তিক, উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্রকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয় যা জীবন ধারনের নূন্যতম চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপর পক্ষে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারনাটি মূলত: আপেক্ষিক বঞ্চনা নির্দেশক যা একটি গ্রহনযোগ্য এবং নির্দিষ্ট শ্রেনীর মানদন্ডে নির্ধারিত জীবন যাত্রার মান অর্জনের ব্যর্থতা নির্দেশ করে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে দেশে ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্য হার হ্রাস পেয়েছে। তবে এ দেশে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। দারিদ্র্যকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যথাঃ আয় দরিদ্র ও মানব দারিদ্র্য। দারিদ্র্যাবস্থা অনুধাবনের জন্য দুটোর গতিধারাই আলাদাভাবে পর্যালোচনা করা যায়। আয় দারিদ্র্যের দিক থেকে ২০০৫ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ছিল দরিদ্র। অপরদিকে UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report- ২০০৯ হতে দেখা যায় যে, ২০০৭ সালে মানব-দারিদ্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল বিশ্বে ১১২তম, যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, ভূটান ও মালদ্বীপের অবস্থান ছিল যথাক্রমে ৮৮, ১০১, ১০২, ৬৬ তম।

১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey- HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ চালানো হয় ২০০৫ সালে। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake- FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calorie Intake- DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। দারিদ্র্য পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহনকে চরম দারিদ্র্য (Hard-core poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথমবারের মত ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs- CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, ২০০০ ও ২০০৫ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non food) ভোগ্য পন্য অন্তর্ভূক্ত হয়।

দারিদ্র্যের গতিধারা ঃ

১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধে¨ (CBN উচ্চ দারিদ্র্য রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্র্যের হার ৫৮.৮ শতাংশ থেকে ৪৮.৯ শতাংশে নেমে আসে (সারণী- ১০.১), এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ১.৮ শতাংশ। তবে দারিদ্র্যের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ২.২% হারে)। অপরদিকে ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আয় দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে এসেছে এবং এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। এই সময়কালেও দারিদ্র্যের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২% হারে)।

সারণী- ১ ঃ আয় দারিদ্র্যের গতিধারা,১৯৯১-২০০৫

মাথা গণনা সূচক	২০০৫	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০-২০০৫)	১৯৯১-৯২	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০-২০০৫)
মাথা গণনা সূচক					
জাতীয়	৪০.০	৪৮.৯	-৩.৯	৫৮.৮	-১.৮
শহর	২৮.৪	৩৫.২	-৪.২	৪৪.৯	-২.২
পল্লী	৪৩.৮	৫২.৩	-৩.৫	৬১.২	-১.৬
দারিদ্র্য ব্যবধান					
জাতীয়	৯.০	১২.৮	-৬.৮০	১৭.২	-২.৯
শহর	৬.৫	৯.১	-৬.৫১	১২.০	-২.৫
পল্লী	৯.৮	১৩.৭	-৬.৪৮	১৮.১	-২.৮
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.৯	৪.৬	-৮.৮১	৬.৮	-৩.৮
শহর	২.১	৩.৩	-৮.৬৪	৪.৪	-২.৭
পল্লী	৩.১	৪.৯	-৮.৭৫	৭.২	-৩.৮

উৎস ঃ বিবিএস খানা আয় ও ব্যয় জরিপ- ২০০৫।

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত নগর ও পল্লী এলাকায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান পরিমাপিত) ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ পরিমাপিত) প্রায় সমভাবে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে পল্লী এলাকায় আয় দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা হ্রাসের হার শহর এলাকার চেয়ে অধিক ছিল।

প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রবণতা

সারণী ২: মাথা গণনা অনুপাতে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য প্রবণতা ১৯৯১-২০০৫ ঃ

জরিপ বছর	দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণ					
	জাতীয়		পলী অঞ্চল		শহরাঞ্চল	
	(মিলিয়ন)	(%)	(মিলিয়ন)	(%)	(মিলিয়ন)	(%)
২০০৫	৫৬.০	৪০.৪	৪১.২	৩৯.৫	১৪.৮	৪৩.২
২০০০	৫৫.৮	৪৪.৩	৪২.৬	৪২.৩	১৩.২	৫২.৫
১৯৯৫-৯৬	৫৫.৩	৪৭.৫	৪৫.৭	৪৭.১	৯.৬	৪৯.৭
১৯৯১-৯২	৫১.৬	৪৭.৫	৪৪.৮	৪৭.৬	৬.৮	৪৬.৭
দারিদ্র্য রেখা- ২ ঃ চরম দারিদ্র্য দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরী খাদ্য গ্রহণ পরিমাপে						
জরিপ বছর	**জাতীয়**		**পল্লীঅঞ্চল**		**শহরাঞ্চল**	
২০০৫	২৭.০	১৯.৫	১৮.৭	১৭.৯	৮.৩	২৪.৪
২০০০	২৪.৯	২০.০	১৮.৮	১৮.৭	৬.০	২৫.০
১৯৯৫-৯৬	২৯.১	২৫.১	২৩.৯	২৪.৬	৫.২	১৭.৩
১৯৯১-৯২	৩০.৪	২৮.০	২৬.৬	২৮.৩	৩.৮	২৬.৩

উৎস ঃ বি বি এস খানা আয় ও ব্যয় জরিপ- ২০০৫

মাথা গণনা অনুপাতে ২০০৫ সালে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে অনপেক্ষ দারিদ্র ছিল ৪০.৪ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে তা ছিল ৩৯.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৩.২ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে অনপেক্ষ দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ছিল ৫.৫৮ কোটি যা ২০০৫ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৬০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র জনসংখ্যা ২০ লক্ষ বৃদ্ধি পেলেও তা পূর্বের তুলনায় হ্রাসকৃত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাথা গণনা অনুপাতে ২০০৫ সালে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য ছিল ১৯.৫ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে তা ছিল ১৭.৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৪.৪ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য ০.৫ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে ০.৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ০.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে চরম দারিদ্র্য ২০.০ শতাংশ থেকে ১৯.৫ শতাংশে দাড়িয়েছে। অনপেক্ষ দারিদ্র্য এর মত চরম দারিদ্রে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ এ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা ১৯৯১-৯২ এর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

মাথা গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারী দারিদ্র্য প্রবণতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন বিভাগের শহরে ও পল্লীতে দারিদ্রের হার নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ও উচ্চ দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী নিম্নের সারণীতে দেখানো হল ঃ

সারণী ৩: মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারী দারিদ্রের হার (মাথা গণনা অনুপাত), ২০০০-২০০৫

জাতীয় / বিভাগ	২০০৫			২০০০		
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬	৩৪.৩	৩৭.৯	২০.০
বরিশাল	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪	৩৪.৭	২৫.৯	২১.৭
চট্টগ্রাম	১৬.১	১৮.৭	৮.১	২৭.৫	৩০.১	১৭.১
ঢাকা	১৯.৯	২৬.১	৯.৬	৩৪.৫	৪৩.৬	১৫.৮
খুলনা	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮	৩২.৩	৩৪.০	২৩.০
রাজশাহী	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪	৪২.৭	৪৩.৯	৩৪.৫
সিলেট	২০.৮	২২.৩	১১.০	২৬.৭	২৬.১	৩৫.২
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে						
জাতীয়	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪	৪৮.৯	৫২.৩	৩৫.২
বরিশাল	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪	৫৩.১	৫৫.১	৩২.০
চট্টগ্রাম	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮	৪৫.৭	৪৬.৩	৪৪.২
ঢাকা	৩২.০	৩৯.০	২০.২	৪৬.৭	৫৫.৯	২৮.২
খুলনা	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২	৪৫.১	৪৬.৪	৩৮.৫
রাজশাহী	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২	৫৬.৭	৫৮.৫	৪৪.৫
সিলেট	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬	৪২.৪	৪১.৯	৪৯.৬

উৎস ঃ বি বি এস খানা আয় ও ব্যয় জরিপ- ২০০৫।

উপরোল্লিখিত সারণী হতে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্রের হার হল ২৫.১ শতাংশ, সেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে তা দাঁড়ায় ৪০.০ শতাংশে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রের চেয়ে শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য অনেক কম। একই চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভাগওয়ারী দারিদ্রের হারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রতিটি বিভাগেই গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রের হার শহরাঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশী। এবং উভয় ক্ষেত্রেই বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে দারিদ্রের মাত্রা অন্যান্য বিভাগ থেকে অনেক বেশী।

২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে সিলেট বিভাগের শহরাঞ্চলে দারিদ্রের মাত্রাও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে।

জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা

নিম্নে সারণী ৪: এ জমির মালিকানার ভিত্তিতে (উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে সিবিএন পদ্ধতিতে) দারিদ্র্য প্রবণতা দেখানো হল ঃ

সারনী ১০.৪ঃ জমির মালিকানা ও দারিদ্র্য, ২০০০-২০০৫

জাতীয় / বিভাগ	২০০৫			২০০০		
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সকল	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬	৩৪.৩	৩৭.৯	২০.০
ভূমিহীন	২৫.২	৪৯.৩	১৭.৮	৩০.৪	৫৩.১	২০.৫
<০.০৫	৩৯.২	৪৭.৮	২৩.৭	৪৩.৩	৪৮.৮	২২.৩
০.০৫-০.৪৯	২৮.২	৩৩.৩	১১.৪	৪০.৪	৪১.৭	১২.৬
০.৫০-১.৪৯	২০.৮	২২.৮	৯.১	২৯.৬	৩০.৬	১৫.৪
১.৫০-২.৪৯	১১.২	১২.৮	২.৭	২১.৯	২২.৯	১.৪
২.৫০-৭.৪৯	৭.০	৭.৭	৩.০	১১.৫	১২.৪	০.০
৭.৫০ +	১.৭	২.০	০.০	৪.০	৪.১	০.০
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে						
সকল	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪	৪৮.৯	৫২.৩	৩৫.২
ভূমিহীন	৪৬.৩	৬৬.৬	৪০.১	৪৬.৬	৬৯.৭	৩৬.৬
<০.০৫	৫৬.৪	৬৫.৭	৩৯.৭	৫৭.৯	৬৩.০	৩৮.৩
০.০৫-০.৪৯	৪৪.৯	৫০.৭	২৫.৭	৫৭.১	৫৯.৩	২৭.৩
০.৫০-১.৪৯	৩৪.৩	৩৭.১	১৭.৪	৪৬.২	৪৭.৫	২৭.৪
১.৫০-২.৪৯	২২.৯	২৫.৬	৮.৮	৩৪.৩	৩৫.৪	১০.২
২.৫০-৭.৪৯	১৫.৪	১৭.৪	৪.২	২১.৯	২২.৮	৯.১
৭.৫০ +	৩.১	৩.৬	০.০	৯.৫	৯.৭	০.০

উৎস ঃ বি বি এস খানা আয় ও ব্যয় জরিপ- ২০০৫।

২০০৫ সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য পরিমাপে দেখা যায় যে, ৪৬.৩ শতাংশ জনগণ ভূমিহীন, ৫৬.৪ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫ এককের নীচে, ৪৪.৯ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ৩৪.৩ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.৫০-১.৪৯, ২২.৯ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর। ১৫.৪ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং ৩.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্দ্ধে। এছাড়া মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য পরিমাপে লক্ষ্যনীয় যে, ৩৯.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ২৮.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২০.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.৫০-১.৪৯ একর, ১১.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫০-২.৪৯ একর, ৭.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং ১.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্দ্ধে। দেখা যায় যে, ভূমিহীন ও নগন্য পরিমাণ ভূমি সম্পন্ন জনগণের হার বেশী। সুতরাং দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হলে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যোন্নয়ন প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

নিম্নে ৫ সারণীতে ২০০০ এবং ২০০৫ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত দেওয়া হল ঃ

সারণী- ৫ ঃ জাতীয় পর্যায়ে পরিবার ভিত্তিক আয়বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত, ২০০০-২০০৫

পরিবার গ্রুপ	২০০৫			২০০০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল- ১	২.০০	২.২৫	১.৮০	২.৪১	২.৮০	২.০২
ডিসাইল- ২	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২	৩.৭৬	৪.৩১	৩.০৭
ডিসাইল- ৩	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭	৪.৫৭	৫.২৫	৩.৮৪
ডিসাইল- ৪	৫.৮০	৫.৪২	৪.৬১	৫.২২	৫.৯৫	৪.৬৮
ডিসাইল- ৫	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬	৬.১০	৬.৮৪	৫.৬০
ডিসাইল- ৬	৭.১৭	৭.৬৭	৬.৭৮	৭.০৯	৭.৮৮	৬.৭৪
ডিসাইল- ৭	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩	৮.৪৫	৯.০৯	৮.২৪
ডিসাইল- ৮	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮	১০.৩৯	১০.৯৭	১০.৪৬
ডিসাইল- ৯	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮	১৪.০০	১৪.০৯	১৪.০৪
ডিসাইল- ১০	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮	৩৮.০১	৩২.৮১	৪১.৩২
জিনি অনুপাত	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭	০.৪৫১	০.৩৯৩	০.৪৯৭

উৎস ঃ বি বি এস খানা আয় ও ব্যয় জরিপ- ২০০৫।

সারণী ১০.৫ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল- ১ থেকে ডিসাইল- ৫ অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলোতে জাতীয় পর্যায়ে আয় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল- ৬ থেকে ডিসাইল- ৯ অন্তর্ভূক্ত পরিবারগুলোর আয় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১২.১

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। দারিদ্র বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশে দারিদ্রের গতিধারা বিশ্লেষণ করুন ।

৩। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য প্রবনতা ব্যাখ্যা করুন ।

৪। বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী দারিদ্র্য প্রবনাতা মূল্যায়ন করুন।

৫। বাংলাদেশে জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবনাতা ব্যাখ্যা করুন ।

৬। বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টন অর্থাৎ সমাজের আয় বৈষম্য বিশ্লেষন করুন ।

পাঠ-২ : দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রধান নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্রের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায়সমূহ নির্দেশ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত কৌশলসমূহ বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলসমূহের সবলতা, দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি ও দারিদ্র নিরশন কৌশল কাঠামো (পিআরএসপি) সর্ম্পকে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশে দারিদ্রতার কারণসমূহ ঃ

শিক্ষার্থীবৃন্দ পূর্বের পাঠে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের পরিস্থিতি ও মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান পাঠে বিদ্যমান দারিদ্রের কারণসমূহ, তা দূরীকরণের উপায়সমূহ এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কৌশলসমূহ আলোচনা করা হল।

প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী কাজ পাওয়া একটি মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র এই মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে। ফলশ্রুতিতে দেশের মানুষের প্রতিভা বিকশিত হবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনাবিল শান্তি নেমে আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ ও রাষ্ট্র নানাবিধ সমস্যায় ভারাক্রান্ত। যার ফলশ্রুতিতে দেশ ও জনগণ দারিদ্র্যতায় আক্রান্ত। নিম্নে দারিদ্র্যতার কারণসমূহ উল্লেখ করা হল ঃ

১। ঔপনিবেশিক শোষণ ঃ তৎকালীন ভারতবর্ষ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ ছিল। ইংরেজরা এদেশকে কাঁচামালের উৎস ও নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে কুটির শিল্পগুলোকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। ফলে এদেশের মাথাপিছু আয় আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এভাবে ব্রিটেনে সমৃদ্ধির আলো জ্বালাতে গিয়ে এদেশের মানুষ আস্তে আস্তে রিক্ত হয়ে পড়ে।

২। পাকিস্ড়ান সরকারের অবহেলা ঃ পাকিস্ড়নি আমলের ২৪ বছরে পাকিস্ড়নি শাসকবৃন্দ বাংলাদেশের জনগণের ভাগোন্নয়নে অন্ড়রায় সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের সম্পদ দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করেছে। ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

৩। শিল্পে অনগ্রসরতা ঃ বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর। ব্রিটিশ আমলে এদেশে শিল্পোন্নয়ন হয়নি। পাকিস্তান আমলেও এখানে শিল্পোন্নয়নের গতি ছিল মন্থর। স্বাধীনতার পরও অবস্থার তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। ফলে আমাদের জনগণের মাথাপিছু আয় কম ও তারা দরিদ্র।

৪। অনুন্নত কৃষি ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪৮ শতাংশ মানুষ কৃষি কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু আমাদের কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও আমাদের কৃষকেরা লাঙল জোয়ালের সাহায্যে চাষাবাদ করে। যান্ত্রিক চাষাবাদ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার খুবই কম। ফলে আমাদের দেশে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ ও কৃষকের মাথাপিছু আয় খুবই কম।

৫। ক্ষেত মজুর ঃ বাংলাদেশের ৫২% ভূমিহীন পরিবারের বেশীর ভাগ শ্রমিক ক্ষেত মজুর হিসাবে কাজ করে। বর্তমান গড় মজুরী পুরুষদের ১০০-১৫০ টাকার উর্ধ্বে নয়, মহিলাদের মজুরী ৫০-৮০ টাকা। এদিক থেকে দরিদ্র্য কৃষকেরা কি করে জীবন যাপন করে, উত্তরহীন প্রশ্ন থেকে যায়। এছাড়া শাসিত সমাজে মেয়েরা পুরুষদের পরে খেতে বাধ্য হয়। ফলে মেয়েরা আরো শোষিত হয়।

৬। মজুরী হ্রাস ঃ স্বাধীনতার পর শ্রমিক শ্রেণীর দৈন্যতা আরো বাড়ছে। মাথাপিছু আয় নামমাত্র অল্প কিছু বেড়েছে। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরী সামান্য বেড়েছে।

৭। উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘণত্ব ঃ ২০০৯ সালের জাতিসংঘের হিসেবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। ১৯৯১ সালে ছিল ১০.৪ কোটি। ১৯৮১ সালে ছিল ৮.৯৯ কোটি। ১৯৮১ সালে জনসংখ্যার ঘণত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিচারে ৬২৪ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ১৯৯১ তা ৭৮২ জনে উন্নীত হয়। বর্তমানে প্রায়

১১৭৬ জন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৮%। দেশের মোট জনশক্তির ৩৬% ই হল ১-১৪ বছর বয়সের নীচে ও ৬০ বৎসরের উপরের বয়সের যারা কাজ করে না। যারা আয় সৃষ্টিতে অবদান রাখে না। জনসংখ্যার ঘণত্ব বাড়ার সাথে সাথে জমির উপর চাপ বাড়ছে। বাড়ীর জায়গা, অবকাঠামো ও সরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ডে মানুষের চাষের জমি ক্রমেই কমছে। ১৯৬০ সালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.৩৭ একর, ১৯৭৭ সালে ০.২৬ একর, ১৯৮৫ সালে ০.২৫ একর এবং বর্তমানে ০.১৮ একর। ভূমিহীন দিন মজুরদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে। একই সাথে দারিদ্রতাও বাড়ছে।

৮। **বেকারত্ব ঃ** ক্রমবর্ধমান বেকারত্বকে দারিদ্রতার নির্ধারক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দেশের বেকারত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে দরিদ্রতার প্রকোপ আরো অবনতিশীল করছে। প্রতি বছর ২২ লক্ষ জনসংখ্যা বাড়ছে। একই সময়ে প্রতি বছর নতুন কাজ চাইছে প্রায় ৮ লক্ষ জনবর্ষ। নতুন কর্মসংস্থান দ্বারা শ্রমের চাহিদা বাড়ে ৭০ হাজার লোকের। বাকী অথনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োগ লাভের সুযোগ পায় দু'তিন লক্ষ। এর পর থাকে ৪ লক্ষ জনশক্তি। এরা পূর্ণ বেকারত্ব, অর্ধবেকারত্ব বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব নিয়ে অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। মোট জনশক্তির ৩০% বেকার। এরা অন্যের উপর নির্ভর করে।

৯। **ভূমিহীনতা ঃ** ভূমিভিত্তিক অর্থনীতিতে ভূমিহীনতার সাথে দারিদ্রতার একটি ঘণিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। এ দেশের ভূমিহীনরাই চরমভাবে দরিদ্র। ১৯৬০ সালে ভূমিহীনতা ছিল ২৮ ভাগ, ১৯৬৮ সালে ছিল ৩১ ভাগ, ১৯৮১ সালে ছিল ৫২ ভাগ এবং বর্তমানে এই হারে ৫৮ বলে কেউ কেউ অনুমান করছেন। তা হলে দারিদ্রতার চরম সীমার নীচে পৌঁছানোর সাথে ভূমিহীনতার ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।

১০। **মূলধনের অভাব ঃ** বাংলাদেশ বেকার সমস্যায় জর্জরিত। বেকারত্বের জন্য বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তির অপচয় হচ্ছে। এর ফলে দেশে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় কমে যাচ্ছে।

১১। **কারিগরি জ্ঞানের অভাব ঃ** কারিগরি শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান অত্যন্ড় অল্প। কুশলি শ্রমিকের অভাবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান নিম্ন।

১২। **দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঃ** বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বাংলাদেশের জনজীবন দূর্বিসহ করে তুলেছে এবং জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান নিচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১৩। **নৈসর্গিক বিপর্যয় ঃ** আমাদের দারিদ্র্যের পিছনে প্রকৃতির ভূমিকাও কম নয়। বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু বন্যা , খরা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কারণে প্রতি বছর আমাদের বিপুল পরিমাণ শস্যের ক্ষতি হয়।

১৪। **নারী শিক্ষার অভাব ঃ** বাংলাদেশের শ্রমশক্তির অর্ধেক মহিলা। কিন্তু শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবে এদেশের অধিকাংশ মহিলার কর্মজীবন সংসারের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকে। ঘরের বাইরে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের কোন ভূমিকা নেই। ফলে এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশী এবং দেশটি দরিদ্র।

১৫। **সম্পদের অসম বন্টন ঃ** আমাদের দেশে সম্পদের বন্টন ব্যবস্থাও সুষম নয়। বাংলাদেশের সম্পদের সিংহভাগ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

১৬। **সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ঃ** আমাদের দেশে এখনও উন্নত দেশের অনুরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়নি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মানুষ এখনও সমাজ সচেতন নয়। দেশ থেকে দূর্নীতি দূর হয়নি। হরতাল, ধর্মঘট, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি কারণে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য এদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে।

১৭। **দূর্বল অবকাঠামো ঃ** বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। মূলধন এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবে এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তি এখনো সুদৃঢ় কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দূর্বল অবকাঠামোর কারণে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। যার কারণে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটছে না।

১৮। **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ঃ** মূলধন, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যৌক্তিক ব্যবহার সম্ভবপর হচ্ছে না। ফলে প্রাচুর্যের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম।

১৯। **বিশ্ব মন্দা ও সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির প্রভাব ঃ** ২০০৫ হতে ২০০৮ পর্যন্ড় মূল্যস্ফীতির ফলে বাংলাদেশে দরিদ্রদের উপর ঋনাত্বক প্রভাব পড়ে। ২০০৮ সালে অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২০০৭ সালের এপ্রিল হতে ২০০৮ সালের মার্চ সময়কালে চালের দাম ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দারিদ্ররেখা উর্ধ্বমুখী হয়। এর ফলে ২০০৫ হতে ২০০৮ সালের মধ্যে দারিদ্র্য নিরসনে যে প্রাক্কলন করা হয়েছিল (প্রায় ৫ শতাংশ) দারিদ্র্যের হার সে পরিমাণ না কমে মাত্র ২ শতাংশ হ্রাস পায় যা বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব ও দারিদ্র বিমোচনে ঋণাত্মক প্রভাব পরে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় ঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে সমাজদেহ থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর করতে হলে আমাদেরকে উপরিউক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১। কৃষি উন্নয়ন ঃ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কাজেই কৃষি উন্নয়নে আমাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পুরাতন পদ্ধতির চাষাবাদ পরিহার করে কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্য দূর হবে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

২। শিল্পোন্নয়ন ঃ অতীতের সকল ব্যর্থতা মুছে ফেলে শিল্পোন্নয়নের জন্য আমাদেরকে একটি সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়বে। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমানে দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৩। জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ঃ আমাদের দেশে বর্তমানে যে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা রোধ করতে না পারলে উন্নয়নের সকল পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে। সুতরাং দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে পরিবার পরিকল্পনা সুষ্ঠূ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই উত্তাল তরঙ্গকে অবশ্যই রোধ করতে হবে। পাশাপাশি গ্রামে গঞ্জে নারী–পুরুষদের প্রাথমিক মৌলিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মূলত নারীর ক্ষমতায়ন, কুসংস্কারমুক্ত ও সমাজসচেতন দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

৪। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ঃ দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিন্ত করতে হবে। দেশে কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন এবং প্রয়োজনবোধে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আমদানি করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

৫। শিক্ষা বিস্ড়র ঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার একান্ত অপরিহার্য।

৬। কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের দারিদ্র্য দূর করতে হলে দেশে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে।

৭। মূলধন গঠণ ঃ মূলধনের অভাবে আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং দেশে মূলধন গঠণের হার বৃদ্ধি করার জন্য সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। বেকার সমস্যার সমাধান ঃ বাংলাদেশ বেকার সমস্যায় জর্জরিত। এদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে বেকার সমস্যার আশু সমাধান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নানা ধরনের গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও হাল্কা শিল্পের ব্যবস্থা করে গ্রামের বেকার লোকদের জন্য কাজের সংস্থান করা যেতে পারে।

৯। মহিলা সমাজের উন্নয়ন ঃ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হল মহিলা। সুতরাং মহিলাদের অবস্থার উন্নতি না করে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়া এবং বিবাহ, নারী শিক্ষা ইত্যাদি প্রশ্নে প্রয়োজনীয় আইনের সংশোধন ও মহিলাদের জন্য আলাদা সমবায় আন্দোলনের উপর জোর দিতে হবে।

১০। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিবহন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

১১। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ঃ জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে হলে আমাদেরকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়েছে। বর্তমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে আমাদের অবস্থার নিশ্চয়ই উন্নতি হবে।

১২। সামাজিক ও ধর্মীয় গোড়ামি ঃ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সকল প্রকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করতে হবে।

১৩। সুষ্ঠু ভূমি সংস্কার নীতি প্রণয়ন ঃ কৃষি বাংলাদেশের জনগণের প্রধান উপজীবিকা। সুতরাং এদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমির মালিকানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এ সমস্ড় ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু ভূমি সংস্কার নীতি প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

১৪। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঃ একটি উন্নয়ন উপযোগী আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উপস্থিতি অথনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সফল করতে হলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক।

১৫। বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঃ জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয়-বৃদ্ধি করা যায়। অতএব, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে আমদানি হ্রাস করতে হবে। বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে দেশে রপ্তানীমুখী শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

১৬। সম্পদের সুষম বন্টন ঃ সম্পদের সুষম বন্টন দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং দেশের সম্পদ যাতে কতিপয় মানুষের নিকট পুঞ্জীভূত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

১৭। ক্ষেত মজুরদের সুযোগ বাড়াতে হবে ঃ শুধুমাত্র কৃষি খামারের কাজে সীমাবদ্ধ না রেখে এসব শ্রমিকের শিল্পখাতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে কৃষির মজুরী কাঠামো ও কাজের শর্ত নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন রয়েছে । এছাড়া কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি পণ্যের মূল্য যথোপযুক্ত করতে হবে।

১৮। মজুরী পরিবর্তন ঃ দেশে বর্তমান প্রায় ১০% মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে। তাই প্রতিবছর মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির হার ৮% এর বেশী করতে হবে অথবা মজুরীর হার বাড়াতে হবে। যাতে শ্রমিক ও কর্মচারীরা সহজে জীবন যাপন করতে পারে।

১৯। পরিকল্পিত উন্নয়ন ঃ এই চরম দারিদ্র্যতা হ্রাসের জন্য একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যে পরিকল্পনায় দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে।

২০। দেশী বিদেশী সংস্থা ঃ দারিদ্র্যতা দূরীকরণে দেশী বিদেশী সংস্থাসমূহকে সমন্বয় করতে হবে এবং উন্নয়ন কাজে তাদের কর্মকান্ড তদারকি করতে হবে।

২১। লক্ষ্যজনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য চাষ, বনায়ন, হাঁস-মুরগী পালন, মৌমাছি পালন, ব্যবসা এসব ক্ষেত্রে নিয়োগ বাড়াতে হবে। এজন্য লক্ষ্যজনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

২২। আঞ্চলিক অসমতা ঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল সবদিক দিয়েই অবহেলিত। যেখানে মাথাপিছু আয় কম, উৎপাদনশীলতা কম, বেকারত্ব বেশী, শিক্ষিতের হার কম, মৃত্যুহার বেশী, জন্ম হারও বেশী, মজুরী কম, বাণিজ্য শর্তে প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের এরূপ বৈষম্য দূরীকরণে সুষম উন্নয়ননীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। যা এ এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

দরিদ্র্য বিমোচনে বিশ্ব ব্যাংকের কৌশলসমূহ ঃ

বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তিনটি কৌশল উদ্ভাবন করে।

ক) সুযোগ বাড়ানো
খ) ক্ষমতায়ন এবং
গ) নিরাপত্তা জোরদারকরণ

ক) সুযোগ বাড়ানো (Promoting Opportunity) ঃ সুযোগ বাড়ানোর বিষয়টি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দরিদ্রদের অংশ বাড়ানো, সম্পদের অধিকার বাড়ানো এবং সম্পদের উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান মাত্রা সৃষ্টি করা। সম্পদের উপর অধিকার অর্থ--

- প্রাকৃতিক সম্পদ তথা জমিতে অধিকার
- মানবীয় সম্পদ -শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে অধিকার
- আর্থিক সম্পদ তথা ঋণ গ্রহণের সুযোগদান
- সামাজিক সম্পদ ও নেট ওয়ার্কিং এর সুযোগ।

এই সুযোগগুলো সরকার দিতে পারে এবং এজন্য প্রয়োজন হল----

- সম্পদ পূনঃবন্টন দ্বারা
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করা
- জমি ও ঋণ পেতে পারে, এর সুযোগ সৃষ্টি করা।

একটি স্থবির অর্থনীতিতে দারিদ্র্য নিরসন হয় না। প্রবৃদ্ধির হার ১% হলেও দারিদ্রতা ২% কমতে পারে। আবার একই প্রবৃদ্ধির হারে কোন দেশে দারিদ্র্য নিরসন বেশি হয়, কোন দেশে কম হয় । বিশ্ব ব্যাংকের গবেষক (Dollar and Krany) ৮০টি দেশের ৪০ বৎসরের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে দেখান অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধনী ও দরিদ্র্য উভয়ের অবস্থাই ভালো করে।

খ) ক্ষমতায়ন (Facilitating Empowerment) ঃ দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন বলতে সিদ্ধান্ড়গ্রহণে অংশ নেয়া, সাম্প্রদায়িক বা উপজাতীয় (Ethnic), ধর্মীয় (Religious), পুরুষ-মহিলা (Sexual) বৈষম্য হ্রাস করা এবং রাষ্ট্র হবে অবশ্যই দরিদ্রের কাছে জবাবদিহিতামূলক এবং দায়িত্বশীল।

রাষ্ট্র দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে যে কাজগুলো করবে ঃ

- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দরিদ্রদের অধিকার গ্রহণে দূর্নীতি ও হয়রানি বন্ধ করবে
- দরিদ্রদের আইনি সহায়তা দেয়ার সুযোগ থাকবে এবং Good Governance থাকবে।
- স্থানীয় সেবাসমূহ এলাকার উচ্চবিত্তদের দ্বারা যেন করায়ত্ত না হয়।
- রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দারিদ্রদের অংশগ্রহণে উৎসাহিতরণ।
- দরিদ্রের বিরুদ্ধে সরকারী সমর্থন মূলক কার্যক্রম থাকবে।

গ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ঃ দরিদ্রদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অর্থনৈতিক দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শস্যহানি, ভগ্নস্বাস্থ্য, সন্ত্রাস, দাঙ্গা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার দরিদ্রদের সহায়তা করবে। দুঃস্থদের জন্য সাহায্য বীমা, বার্ধক্য বীমা, বেকারত্ব বীমা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, সামাজিক ফান্ড, নগদ অর্থ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, শস্য বীমা এবং পণ্যের দামের অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে দরিদ্রদের রক্ষা করতে হবে।

আন্ড়র্জাতিক কার্যক্রমও হিসেবে থাকতে হবে -----

- বিশ্বকে সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করা।
- দরিদ্র দেশের বাজার উন্নত দেশে তুলে ধরা
- বিশ্বমানের দ্রব্য সরবরাহ বাড়ানো। দুর্যোগ মোকাবেলা, কৃষি ও শিক্ষা, গবেষণা, জ্ঞানের বিতরণ করা।
- বেশী করে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ দান।
- আই.এম. এফ, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কর্মকান্ডে দরিদ্র দেশের কথা বলার বেশী সুযোগ দান করতে হবে।

এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এর মতে নীতি গ্রহণে অর্থায়নকে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলসমূহ

বর্তমান কালে অর্থনীতিবিদগণ শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে রাজি নন। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি এর সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেকের মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধি পায় তবেই তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে গণ্য করা যেতে পারে। সুতরাং দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য সীমার নীচে রেখে শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায় না। অতএব, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ একান্ড় আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে সঠিক দারিদ্র্য বিমোচনকারী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা দরকার।

দারিদ্র্য বিমোচনকারী উন্নয়ন কৌশল (Poverty Alleviation Development Strategies) ঃ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বলতে দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে সঠিক পদ্ধতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করাকে বোঝায়। দারিদ্র্য কর্মসূচীকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- (ক) প্রত্যক্ষ কর্মসূচী, (খ) পরোক্ষ কর্মসূচী।

ক) প্রত্যক্ষ কর্মসূচী (Direct Policy) ঃ দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যক্ষ কর্মসূচী বলতে লক্ষ্যদল (Target Group) ভিত্তিক আয় বর্ধনকারী কর্মসূচী গ্রহণ করাকে বোঝায়। প্রবৃদ্ধি হলেই দারিদ্র্য নিরসন হয় না। কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফসল অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ধনীরাই তুলে নেয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী তিমিরেই থেকে যায়। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'নিরাপত্তা বেষ্টনী' (Safety Cordon) বিস্তার করা প্রয়োজন হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এরূপ নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্ড়ার করা প্রত্যক্ষ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্য। দেশের দরিদ্র জনগণের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, পঙ্গু ও বৃদ্ধদের জন্য ভাতা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যক্ষ কৌশলের অন্তর্গত। চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে অনাহার থেকে বাঁচানো এবং তাদের আয় বর্ধনকারী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেস্ট রিলিফ (Test Relief), ভিজিডি (Vulnerable Group Develoment), জি আর (Gratuitious Relief), ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) ইত্যাদি নিরাপত্তা বেষ্টনী গ্রহণ করে থাকে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী খাতে ৩.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

খ) পরোক্ষ কর্মসূচী (Indirect Policy) ঃ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কর্মসূচীকে দারিদ্র্য বিমোচনের পরোক্ষ কর্মসূচী বলে। যেমন- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেশী হলে দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। ফলে দারিদ্র্য লাঘব হয়। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী মানুষের সংখ্যা ০.৯ শতাংশ হ্রাস পায়। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যাতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। তদুপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক অককাঠামোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের যোগ্যতা বাড়ে। দারিদ্র্য বিমোচনের পরোক্ষ কর্মসূচী হিসেবে বাংলাদেশে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি ও দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামো (পি. আর. এস.পি.)ঃ

দেশের উন্নয়নের ধারা সুসংহত করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্ড়বায়িত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে দারিদ্র বিমোচন করাই ছিল এ পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম লক্ষ্য। এ উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশে আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমান সরকার অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্নভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ব্যাপারে নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশল সময়োপযোগী করে দ্বিতীয় বারের মত সংশোধন (দিন বদলের পদক্ষেপ: দ্রুত দারিদ্র নিরসনের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র (২০০৯-২০১১) করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে বর্তমানে ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল মেয়াদে বাস্ড়বায়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়নাধীন আছে, যা খুব শীঘ্রই চূড়ান্ড় করা হবে। এছাড়াও দেশের উন্নয়নের জন্য সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যার প্রতিফলন ঘটবে প্রণয়নাধীন এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)। এ রূপকল্প রূপায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। এ দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের আলোকে, মধ্যমেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে সরকার যে ৫টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে দারিদ্র ও বৈষম্য দূরীকরণ অন্যতম। উল্লেখ্য, দারিদ্র নিরসনসহ আরো কতিপয় এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রভূত সাফল্য লাভ করছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে।

নতুন সহস্রাব্দে বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশসমূহের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের উদ্যেগে বিগত ২০০০ সালে ৮টি উন্নয়ন লক্ষ্য সম্বলিত Millennium Development Goals বা MDGs নির্ধারণ করা হয়। জাতিসংঘ–বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে "Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report ২০০৮চ শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশি- ষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে আগ্রগামী আছে।

সারণী: একনজরে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত)	ভিত্তি বৎসর ১৯৯০/৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা
লক্ষ্যমাত্রা–১ঃ চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ			
লক্ষ্য ১ কঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা			
১.১ জাতীয় উচ্চ দারিদ্র রেখা এর নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (২১২২ কি. ক্যাল.)	৫৬.৬	৪০.০ (২০০৫)	২৯.০
১.২ দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত	১৭.০	৯.০ (২০০৫)	৮.০
১.৩ জাতীয় ভোগ এ দারিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা অংশ	৬.৫	৫.৩ (২০০৫)	প্রযোজ্য নয়
লক্ষ্য ১খঃ মহিলা ও যুবসমাজ সহ সকলের জন্য পুর্ণকালীন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ			
১.৫ মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার	৪৮.৫	৫৮.৫ (২০০৫)	সকলের জন্য
লক্ষ্য ১গঃ ক্ষুধাক্লীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা			
১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ওজনসম্পন্ন শিশুদের অবস্থা	৬৬.০	৪৭.৮ (২০০৫)	৩৩.০
১.৯ নূন্যতম খাদ্যশক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী	২৮.০	১৯.৫ (২০০৫)	১৪.০

জনসংখ্যার হার			

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামো

পাঁচটি ব-ক ও পাঁচটি সহায়ক কৌশল সমবায়ে সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের দারিদ্র নিরসন কাঠামো নির্মিত হয়েছে। কৌশল ব-কগুলো নিম্নরূপ:

কৌশলগত ব্লক ১ ঃ দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি,
কৌশলগত ব্লক ২ ঃ দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি,
কৌশলগত ব্লক ৩ ঃ দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ,
কৌশলগত ব্লক ৪ ঃ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং
কৌশলগত ব্লক ৫ ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন।

দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রে নির্ধারিত বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের ব্যয় বাবদ মোট বরাদ্দ রয়েছে ৬৮,৩৫৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬০.০৫ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১৩,৫৬২.১৪ কোটি টাকা (বাজেটের প্রায় ১৭.৬২%) বরাদ্দ রয়েছে যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১২,৮৮২.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিডি কর্মসূচি, গ্রামীন সড়ক, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। অপরদিকে, শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি যথা–শিক্ষার জন্য খাদ্য/ অর্থ, বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি যেমন শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে, তেমনি মানব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ব্যাংকে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে তরুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে।

Millennium Development Goals ঃ

১৯৯৭ সালে ওয়াশিংটনে বিশ্বের দারিদ্র প্রপীড়িত ১৩৭টি দেশের প্রতিনিধিরা বিশ্বের দশ কোটি দারিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পরবর্তী শতাব্দীর জন্য বেশ কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করে। যা তিন মেয়াদে ২০০৫, ২০১০ এবং ২০১৫ বাস্ড়বায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়, যা Millennium Development Goals নামে পরিচিত।

Millennium Development Goals সমূহঃ

Millennium Development Goals-১: চরম দারিদ্রতা এবং ক্ষুধা নিবারণ।

লক্ষ্য–১ ১৯৯০-২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্রতা অর্ধেকে কমিয়ে আনা।

লক্ষ্য–২ ১৯৯০-২০১৫ সালের মধ্যে ন্যূন্যতম শক্তি গ্রহণের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং নিম্ন ওজনের শিশুর হার (৫ বছরের নীচে) অর্ধেকে কমিয়ে আনা।

লক্ষ্য–৩ ১৯৯০-২০১৫ সালের মধ্যে যারা বিশুদ্ধ পনি পায়না তাদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

Millennium Development Goals-২: সার্বজনীন প্রথমিক শিক্ষা অর্জন।

লক্ষ্য–৪ ১৯৯০-২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রথমিক শিক্ষা অর্জন করা।

Millennium Development Goals-৩: নারী পুরুষ প্রভেদ কমিয়ে আনা।

লক্ষ্য–৫ ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের বৈষম্য মুছে ফেলা এবং ২০১৫ সালের পর সকল স্ড়রে এ বৈষম্য বিদূরিত করা।

Millennium Development Goals-৪: শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে আনা।

লক্ষ্য–৬ ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের নিচের শিশু মৃত্যুহার দুই তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা।

Millennium Development Goals-৫: মহিলাদের পুনঃজন্মদান ক্ষমতার উন্নয়ন করা।

লক্ষ্য–৭ ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুহার দুই তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা।

লক্ষ্য–৮ ২০১৫ সালের মধ্যে ৬০% মহিলাদের পুণঃজন্মদান ক্ষমতার, ২০১০ সালের মধ্যে ৮০% এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকল মহিলার জন্য অর্জন করা।

Millennium Development Goals-6HIV/AIDS: ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ করা।

লক্ষ্য–৯ ২০১৫ সালের মধ্যে HIV/AIDS থামিয়ে দেয়া।

লক্ষ্য–১০ ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ করা।

Millennium Development Goals-৭ : পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা।

লক্ষ্য–১১ ২০০৫ সালের মধ্যে জাতীয়ভাবে স্থিতিশীল উন্নয়ন করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে বিপণন পরিবেশ পূনরুদ্ধার করা।

লক্ষ্য–১২ ২০২০ সালের মধ্যে ১০ কোটি বস্তিবাসীর উন্নয়ন করা।

Millennium Development Goals-৪ : উন্নয়নের বিশ্ব অংশীদারিত্ব বাড়ানো।

লক্ষ্য–১৩ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা বাণিজ্যের উন্নয়ন, আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দারিদ্র বিমোচন করা।

লক্ষ্য–১৪ দারিদ্র দেশগুলোর ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

বাংলাদেশে Millennium Development Goals এর ধরন ঃ

লক্ষ্যমাত্রা	২০০০ ভিত্তি	২০০৫	২০১০	২০১৫
আয়–দারিদ্রতা	৫০	৪৪	৩৫	২৫
বয়স্ক শিক্ষার হার	৫৬	৬৮	৭৯	৯০
প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহন	৭৫	৮৩	৯২	১০০
মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহন	৬৫	৭৫	৮৫	৯৫
শিশু মৃত্যুহার	৬৬	৫১	৩৭	২২
৫ বছরের কম বয়সের মৃত্যুহার	৯৪	৭৩	৫২	৩১
মাতৃ মৃত্যুহার	৩২০	২৮০	২৪০	১৪৭
জীবন প্রত্যাশা	৬১	৬৫	৬৯	৭৩
জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার	১.৬	১.৫	১.৪	১.৩
% নিম্ন ওজনের শিশু	৪৮	৪৩	৩৯	৩৫

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১২.২

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্রের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২। বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্র দূরীকরণের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।

৩। বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে বিশ্বব্যাংকের কৌশলসমূহ পর্যালোচনা করুন।

৪। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচনের কৌশলসমূহের মূল্যায়ন করুন।

৫। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এম. ডি. জি) অর্জনে অগ্রগতি ও দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামো পর্যালোচনা করুন।

পাঠ-৩ ঃ দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থা কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকসহ বেসরকারী সংস্থাসমূহের (NGO's) কার্যক্রম বিশে-ষণ করতে পারবেন।

দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সরকারী কার্যক্রমসমূহ ঃ

১। বিশ্বমন্দা পরবর্তী সময়ে সামাজিক নিরাপত্তায় গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজে আশু করণীয় পদক্ষেপ হিসাবে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের (খাদ্য) বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১২,৮৮২.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (২০০৯-১০) এর আওতায় পলিসি সাপোর্ট হিসাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্ড়বায়নের অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- চলতি অর্থবছরে ভিজিএফ(VGF) বরাদ্দ ২.৭৫ লক্ষ হতে ৫.৫ লক্ষ মে. টন এবং টি.আর (TR) বরাদ্দ ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫০০ মেঃ টন থেকে ৪ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে।

- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ বিভিন্ন তহবিল গঠণ করা হয়েছে যার বরাদ্দ ১২৮৮২.৩৫ কোটি টাকা (২০০৯-২০১০ অর্থবছরে)। এছাড়া ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল বাবদ ৭০০.০০ কোটি টাকা ও বিভিন্ন কর্মসূচীর জন্য ৬৩৬.০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

- সরকারের ভরংপধষ কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

- দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF). মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেন্ট ফান্ড (MDF), সোস্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (IDCOL) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিল সমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরi (PKSF) (পি. কে. এস. এফ), (SDF) (এস. ডি. এফ.) এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ১৮৫.০০ কোটি টাকা হতে ২০০.০০ কোটি টাকা এবং ৯২.৭০ কোটি টাকা হতে ২৯৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

- খাদ্য নিরাপত্তা, বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাতার হার ও পরিমান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

  প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর অনুকূলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ঃ

সারণী ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

কর্মসূচী	বাজেট (২০০৯-১০) কোটি
নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম)	৫,৫৬৬.৬৮
নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রম ঃ সামাজিক ক্ষমতায়ন	৫৭৩০.২৮
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৫,০৯০.৫২
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী	৩৯৫.০০
বিভিন্ন তহবিল	৯৭৫.০০
নতুন তহবিল	১,২৫০.১৫

২। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম ঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে বয়স্কদের মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ হতে ৩০০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২২.৫০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এ বাবদ ৮১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ ভাতা বাবদ মার্চ ২০১০ পর্যন্ত ৫৫৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন তহবিল ঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এসিড নিক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য জন প্রতি ১০,০০০ টাকা হারে "এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন" তহবিল চালু করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ তহবিলে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং মার্চ ২০১০ পর্যন্ড় ১.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতা ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর ভাতাভোগীর সংখ্যা ২.৬০ লক্ষ। এ কর্মসূচীতে ৬৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং মার্চ ২০১০ পর্যন্ত ৫৩.৭২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম ঃ গ্রামের দরিদ্র্য, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ কর্মসূচীর অধীনে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ হতে বৃদ্ধি করে ৩৫০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৯.২০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ বাবদ ৩৩১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ১৬.৬০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা ঃ দরিদ্র্য গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ কর্মসূচীর অধীনে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬০ হাজার ভাতা ভোগী থেকে ৮০ হাজার ভাতা ভোগীতে, মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায় এবং মোট অর্থ বরাদ্দ ২১.৬০ কোটি থেকে ৩৩.৬০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ বরাদ্দের ১ম কিস্তি বাবদ ১৬.৮০ কোটি টাকা (ডিসেম্বর'০৯) পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস এবং মায়েদেরকে তাদের শিশুদের মাতৃদুগ্ধপানে উৎসাহিতকরণ।

অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম ঃ ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ১.২৫ লক্ষে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা হতে ১৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ঃ মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিআরডিবির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছর পর্যন্ড় বিআরডিবির অনুকূলে ২৫.০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ড় দেশের ৬৪টি জেলায় ২৩,৭২৯ জন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মকান্ডের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা । ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এ খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।

৩। খাদ্য সাহায্য কর্মসূচীর আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রায় ৩.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত ২.১৮ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ব্যয়ে ৬৪টি জেলায় ২১,৪৮৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভিজিডি ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬৪টি জেলায় ৬,২১,০৯১টি পরিবার / উপকারভোগীর মাঝে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল / গম অথবা ২৫ কেজি হারে পুষ্টি আটা বিতরণের জন্য ২,১৭,৩৫৬.৮২ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভিজিএফ ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণায়লাধীন এ কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রায় ৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত উপকারভোগীর মাঝে ২.৪৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ) ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রায় ৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত ১.১১ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য দ্বারা ৬৪টি জেলায় ৪৭,৩৮৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জিআর ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রায় ৬৪ হাজার মেট্রিক টন জিআর চাল ও ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জানুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত ৩৬ হাজার ৬২০ মেট্রিক টন চাল এবং ৩.৫৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী হিসাবে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ও ইতোমধ্যে ১১.১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় ক্ষতিগ্রস্ড় পরিবারের ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য ৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা আছে।

৪। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম ঃ

সরকার বর্তমান অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যার অনুকূলে মোট ৩,৬৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

ক) অতি দারিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান

খ) ন্যাশনাল সার্ভিস

গ) কৃষি খাতে জলাবদ্ধতা দূর এবং সেচের জন্য বিশেষ কার্যক্রম

ঘ) বিদেশ প্রত্যাগত ও শ্রম বাজারে আগত নতুন কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

ঙ) শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন

চ) প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র

ছ) একটি বাড়ী একটি খামার কর্মসূচী

জ) ঘরে ফেরা কর্মসূচী।

এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন দপ্তর / সংস্থাসমূহ এবং তফসিলী ব্যাংক সমূহ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। (দেখুন পরিশিষ্ট ১ ও ২)

বেসরাকারী সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ

বাংলদেশে দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি ঘএঙ গুলোও সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলটরী অথরিটি (এমআরএ) ক্ষমতাবান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এমআরএ প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯ সালে গ্রামীণ ব্যাংকসহ দেশের বৃহৎ ২১টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (২০টি সনদপ্রাপ্ত ও প্রশিকা) ২৬,০০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রদান করেছে। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ২.৪২৬ কোটি। এ সময়ে ক্রমপুঞ্জিত মোট ৭৩,২৩২.৩৬ কোটি টাকা সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯৯.২৪ শতাংশ। এসকল সংস্থার মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৪৭৩১.৭৯ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়স্থিতির পরিমাণ ১০৫০৫.৫৬ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ২.৬৫৪ কোটি, সঞ্চয়স্থিতির পরিমাণ ১১৮৭৬.৯৯ কোটি টাকা।

প্রধান প্রধান এনিজওদের সার্বিক কার্যক্রম ঃ

ব্র্যাক ঃ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হল ব্র্যাক। সংস্থাটি বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচী ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষ যেমন অতিদরিদ্র চরবাসী, দুস্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩,০৭০.৭৬ কোটি ও ৩৮,৫,৮২.৮০ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮৩,৫৯,৯৯৩ জন এবং এর মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮০,২৭,২৮২ জন।

আশা ঃ ১৯৯২ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত সংস্থার ক্ষুদ্রঋণসহ মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ ৩,১৩২.০০ কোটি টাকা। ২০০৯ সাল শেষে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ দাঁড়িয়েছে ৩৪,২৫১.০০ কোটি টাকা এবং আদায় হয়েছে ৩১,১১৯.০০ কোটি টাকা। আশা ক্ষুদ্র ঋণ ছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ, এগ্রো বিজনেস ঋণ, দুর্যোগ পুনর্বাসন ঋণ ইত্যাদি ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

প্রশিকা ঃ প্রশিকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিওগুলোর মধ্যে একটি। ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরুর মাধ্যমে প্রশিকার আত্মপ্রকাশ। তবে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৬ সালে। বর্তমানে প্রশিকা ৫৯টি জেলার ২৪,২১১টি গ্রাম এবং ২,১১০টি বস্তিতে কাজ করছে। প্রশিকা ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ১৪,১০,০০০টি প্রকল্প এর মাধ্যমে ৪৩২৫ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। প্রশিকা পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে ১.১৫ কোটি দরিদ্র নারী-পুরুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, দারিদ্র্যমুক্ত হতে সহায়তা করেছে ১২.৩৬ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে।

শক্তি ফাউন্ডেশন ঃ ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, সহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তিঁর দুঃস্থ মহিলাদের ঋণ প্রদান করে। এছাড়া এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সংস্থার বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ১,৫৬৯.৯৮ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ১,৩৩৩.১৯৯ কোটি টাকা।

টিএমএসএস ঃ টিএমএসএস বাংলাদেশের বৃহত্তম নারী উন্নয়ন সংগঠন। সংগঠনটি ১৯৮৫ সালে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। গ্রামের অবহেলিত দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ছাড়াও সংস্থাটি বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এবং নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। টিএমএসএস কর্তৃক ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত বিতরণকৃত ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩৪,৬৩.২২ কোটি টাকা ও আদায় ৩০৯৮.৩২ কোটি টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা ৭,১৬,৫১৯ জন।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস (এসএসএস) ঃ সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণ এর মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ড় সংস্থাটির ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় এবং ঋণের স্থিতি ছিল যথাক্রমে ২১০০.৪২, ১৮৪৮.০১ ও ২৫২.৪১ কোটি টাকা। এ কার্যক্রমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৩,৩৮,৬২৬ জন মহিলা সহ মোট ৩,৫৩,৪৪২ জন।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ ঃ স্বনির্ভর বাংলাদেশ এর আত্মপ্রকাশ ১৯৭৫ সালে। আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংস্থাটি সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক এবং পিকেএসএফ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ড় ৮৮৬.৮৬ কোটি টাকা ১৪৭৮৯৬৮ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে ও ঋণ আদায় হয়েছে ৭০৯.১২ কোটি টাকা।

এছাড়াও অন্যান্য এনজিওসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গ্রামীণ ব্যাংক ঃ

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দারিদ্র্যমুখী ঋণদাতা সংস্থা হিসাবে গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীন ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮৩ লক্ষ। দরিদ্রদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি ভেবে ব্যাংক বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করে থাকে। বিত্তহীন মানুষের হাতে জামানতবিহীন পুঁজি তুলে দিতে পারলে নিজের কর্মসংস্থান সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংক কোন প্রকার জামানত ব্যতিত ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের টাকা সাপ্তাহিক কিস্তিঁতে পরিশোধ করা হয় এবং ব্যাংকের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সাপ্তাহিক কেন্দ্র বৈঠকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর খতিয়ান নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণী ২ ঃ গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋন বিতরণ পরিস্থিতি (৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ড়)

	ক্রমপুঞ্জিভূত ডিসেম্বর ২০০১	২০০২ জানু-ডিসেম্বর	২০০৩ জানু-ডিসেম্বর	২০০৪ জানু-ডিসেম্বর	২০০৫ জানু-ডিসেম্বর	২০০৬ জানু-ডিসেম্বর	২০০৭ জানু-ডিসেম্বর	২০০৮ জানু-ডিসেম্বর	২০০৯ জানু-ডিসেম্বর	ক্রমপুঞ্জিভূত ডিসেম্বর ২০০৯
বিতরণ (টাকা)	৬৯৫৪.৪২	১৭০৬.৫৯	২০৭০.০০	২৫৯০.১৫	৩২৫৭.২১	৪২৬১.৫৪	৬২৩২.৮৭	৮৪২৮.৯০	৭৫৬৮.০৮	৪৩০৭০.৭৬
আদায় (টাকা)	৬১৩০.৮৩	১৬১৪.৭৮	১৮৩৮.০৩	২২৯০.৩১	২৯২৬.৮৪	৩৬২৬.৩৯	৫০৩৬.৯৩	৭৫৬০.০০	৭৬৫৮.৯৯	৩৮৬৮২.৮০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪১৩৮১৩৩	৩৫৩১৫১৩	৩৪০২৪৭৫	৪৮৫৮৭৬৩	৪৮৩৭০৯৯	৫৩১০৩১৭	৭৩৭০৮৪৭	৮০৯০৩৬৯	৮৩৫৯৯৯৩	৮৩৫৯৯৯৩
মহিলা	৪০৮০০৬৭	৩৫১৬৮৩৮	৩৩৯২৯৭৬	৪৭২৭২৮৬	৪৭০৮২৩৪	৫১৪০৪৯৪	৭১০৮১৫৫	৭৭৯৬৭৬৯	৮০২৭২৬২	৮০২৭২৬২
পুরুষ	৫৮০৬৬	১৪৬৭৫	৯৪৯৯	১৩১৪৭৭	১২৮৮৬৫	১৬৯৮২৩	২৬২৬৯২	২৩৯৬০০	৩৩২৭৩১	৩৩২৭৩১

উৎস ঃ গ্রামীণ ব্যাংক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১২.৩

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থা কার্যক্রম বর্ণনা করুন।

২। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকসহ বেসরকারী সংস্থাসমূহের (NGO's) কার্যক্রম বিশ্লেষন করুন।